পাশে বর্ষাই মানায় ভালো। শুনতে পাই, কোনো ইউরোপীয় দার্শনিক আবিষ্কার করেছেন যে, মানবসভ্যতার তিনটি স্তর আছে। প্রথম আসে শ্রুতির যুগ, তার পর দর্শনের, তার পর বিজ্ঞানের। একথা যদি সত্য হয় তো আমরা, বাঙালিরা, আর-যেখানেই থাকি, মধ্যযুগে নেই; আমাদের বর্তমান-অবস্থা হয় সভ্যতার প্রথম-অবস্থা, নয় শেষ-অবস্থা। আমাদের এ যুগ যে দর্শনের যুগ নয়, তার প্রমাণ— আমরা চোখে কিছুই দেখি নে; কিন্তু হয় সবই জানি, নয় সবই শুনি। এ অবস্থায় প্রকৃতি যে আমাদের প্রতি অভিমান করে তাঁর বাসন্তী-মূর্তি লুকিয়ে ফেলবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি।

৩

আমি এইমাত্র বলেছি যে, এ যুগে আমরা হয় সব জানি, নয় সব শুনি। কিন্তু সত্যকথা এই যে, আমরা একালে যা-কিছু জানি সেসব শুনেই জানি— অর্থাৎ দেখে কিংবা ঠেকে নয়; তার কারণ, আমাদের কোনো-কিছু দেখবার আকাঙ্ক্ষা নেই— আর সব-তাতেই ঠেকবার আশঙ্কা আছে।

এই বসন্তের কথাটাও আমাদের শোনা-কথা ও একটা গুজবমাত্র। বসন্তের সাক্ষাৎ আমরা কাব্যের পাকা-খাতার ভিতর পাই, গাছের কচি-পাতার ভিতর নয়। আর বইয়ে যে বসন্তের বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়— তা কস্মিনকালেও এ ভূভারতে ছিল কি না, সেবিষয়ে সন্দেহ করবার বৈধ কারণ আছে।

গীতগোবিন্দে জয়দেব বসন্তের যে রূপবর্ণনা করেছেন, সে রূপ বাংলার কেউ কখনো দেখে নি। প্রথমত, মলয়সমীরণ যদি সোজাপথে সিধে বয়, তা হলে বাংলা-দেশের পায়ের নীচে দিয়ে চলে যাবে, তার গায়ে লাগবে না। আর যদি তর্কের খাতিরে ধরেই নেওয়া যায় যে, সে বাতাস উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে অর্থাৎ পথ ভুলে বঙ্গভূমির গায়েই এসে ঢলে পড়ে, তা হলেও লবঙ্গলতাকে তা কখনোই পরিশীলিত করতে পারে না। তার কারণ, লবঙ্গ গাছে ফলে কি লতায় ঝোলে, তা আমাদের কারও জানা নেই। আর হোক-না সে লতা, তার এদেশে দোদুল্যমান হবার কোনোই সম্ভাবনা নেই এবং ছিল না। সংস্কৃত আলংকারিকেরা 'কাবেরীতীরে কালাগুরু-তরু'র উল্লেখে ঘোরতর আপত্তি করেছেন, কেননা ও বাক্যটি যতই শ্রুতিমধুর হোক না কেন— প্রকৃত নয়। কাবেরীতীরে যে কালাগুরুতরু কালেভদ্রেও জন্মাতে পারে না, একথা জোর করে আমরা বলতে পারি নে; অপরপক্ষে, অজয়ের তীরে লবঙ্গলতার আবির্ভাব এবং প্রাদুর্ভাব যে একেবারেই অসম্ভব, সেকথা বঙ্গভূমির বীরভূমির সঙ্গে

যাঁর চাক্ষুষ পরিচয় আছে তিনিই জানেন। ঐ এক উদাহরণ থেকেই অনুমান, এমন-কি প্রমাণ পর্যন্ত, করা যায় যে, জয়দেবের বসন্তবর্ণনা কাল্পনিক— অর্থাৎ সাদাভাষায় যাকে বলে অলীক। যার প্রথম কথাই মিথ্যে, তাঁর কোনো কথায় বিশ্বাস করা যায় না; অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, এই কবিবর্ণিত বসন্ত আগাগোড়া মন-গড়া।

জয়দেব যখন নিজের চোখে দেখে বর্ণনা করেন নি, তখন তিনি অবশ্য তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের বই থেকে বসন্তের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন; এবং কবি-পরম্পরায় আমরাও তাই করে আসছি। সুতরাং এ সন্দেহ স্বতঃই মনে উদয় হয় যে, বসন্তঋতু একটা কবিপ্রসিদ্ধিমাত্র; ও বস্তুর বাস্তবিক কোনো অস্তিত্ব নেই। রমণীর পদতাড়নার অপেক্ষা না রেখে অশোক যে ফুল ফোটায়, তার গায়ে যে আলতার রং দেখা দেয়, এবং ললনাদের মুখমদ্যসিক্ত না হলেও বকুলফুলের মুখে যে মদের গন্ধ পাওয়া যায়— একথা আমরা সকলেই জানি। এ দুটি কবিপ্রসিদ্ধির মূলে আছে মানুষের ঔচিত্য-জ্ঞান। প্রকৃতির যথার্থ কার্যকারণের সন্ধান পেলেই বৈজ্ঞানিক কৃতার্থ হন; কিন্তু কবি কল্পনা করেন তাই, যা হওয়া উচিত ছিল। কবির উক্তি হচ্ছে প্রকৃতির যুক্তির প্রতিবাদ। কবি চান সুন্দর, প্রকৃতি দেন তার বদলে সত্য। একজন ইংরেজ কবি বলেছেন যে, সত্য ও সুন্দর একই বস্তু— কিন্তু সে শুধু বৈজ্ঞানিকদের মুখ বন্ধ করবার জন্য। তাঁর মনের কথা এই যে, যা সত্য তা অবশ্য সুন্দর নয়, কিন্তু যা সুন্দর তা অবশ্যই সত্য— অর্থাৎ তার সত্য হওয়া উচিত ছিল। তাই আমার মনে হয় যে, পৃথিবীতে বসন্তঋতু থাকা উচিত— এই ধারণাবশত সেকালের কবিরা কল্পনাবলে উক্ত ঋতুর সৃষ্টি করেছেন। বসন্তের সকল উপাদানই তাঁরা মন-অঙ্কে সংগ্রহ ক'রে প্রকৃতির গায়ে তা বসিয়ে দিয়েছেন।

৪

আমার এ অনুমানের স্পষ্ট প্রমাণ সংস্কৃতকাব্যে পাওয়া যায়, কেননা পুরাকালে কবিরা সকলেই স্পষ্টবাদী ছিলেন। সেকালে তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, সকল সত্যই বক্তব্য— সে সত্য মনেরই হোক আর দেহেরই হোক। অবশ্য একালের রুচির সঙ্গে সেকালের রুচির কোনো মিল নেই; সেকালে সুরুচির পরিচয় ছিল কথা ভালো করে বলায়, একালে ও-গুণের পরিচয় চুপ করে থাকায়। নীরবতা যে কবির ধর্ম, এ জ্ঞান সেকালে জন্মে নি। সুতরাং দেখা যাক, তাঁদের কাব্য থেকে বসন্তের জন্মকথা উদ্ধার করা যায় কি না।

সংস্কৃত-মতে বসন্ত মদন-সখা। মনসিজের দর্শনলাভের জন্য মানুষকে প্রকৃতির দ্বারস্থ হতে হয় না। কেননা, মন যার জন্মস্থান, তার সাক্ষাৎ মনেই মেলে।

ও-বস্তুর আবির্ভাবের সঙ্গেসঙ্গেই মনের দেশের অপূর্ব রূপান্তর ঘটে। তখন সে রাজ্যে ফুল ফোটে, পাখি ডাকে, আকাশ-বাতাস বর্ণে-গন্ধে ভরপুর হয়ে ওঠে। মানুষের স্বভাবই এই যে, সে বাইরের বস্তুকে অন্তরে আর অন্তরের বস্তুকে বাইরে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এই ভিতর-বাইরের সমন্বয় করাটাই হচ্ছে আত্মার ধর্ম। সুতরাং মনসিজের প্রভাবে মানুষের মনে যে রূপরাজ্যের সৃষ্টি হয়, তারই প্রতিমূর্তিস্বরূপে বসন্তঋতু কল্পিত হয়েছে; আসলে ও-ঋতুর কোনো অস্তিত্ব নেই। এর একটি অকাট্য প্রমাণ আছে। যে শক্তির বলে মনোরাজ্যের এমন রূপান্তর ঘটে, সে হচ্ছে যৌবনের শক্তি। তাই আমরা বসন্তকে প্রকৃতির যৌবনকাল বলি, অথচ একথা আমরা কেউ ভাবি নে যে, জন্মাবামাত্র যৌবন কারও দেহ আশ্রয় করে না; অথচ পয়লা ফাল্গুন যে বসন্তের জন্মতিথি, একথা আমরা সকলেই জানি। অতএব দাঁড়াল এই যে, বসন্ত প্রকৃতিব রাজ্যে একটা আরোপিত ঋতু।

আমার এসব যুক্তি যদিও সুযুক্তি না হয়, তা হলেও আমাদের মেনে নিতে হবে যে বসন্ত মানুষের মনঃকল্পিত; নচেৎ আমাদের স্বীকার করতে হয় যে, বসন্ত ও মনোজ উভয়ে সমধর্মী হলেও উভয়েরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। বলা বাহুল্য, একথা মানার অর্থ সংস্কৃতে যাকে বলে দ্বৈতবাদ এবং ইংরেজিতে প্যারালালিজম্— সেই বাতিল দর্শনকে গ্রাহ্য করা। সে তো অসম্ভব। অবশ্য অনেকে বলতে পারেন যে, বসন্তের অস্তিত্বই প্রকৃত এবং তার প্রভাবেই মানুষের মনের যে বিকার উপস্থিত হয়, তারই নাম মনসিজ। এ তো পাকা জড়বাদ, অতএব বিনা বিচারে অগ্রাহ্য।

আমার শেষকথা এই যে, এ পৃথিবীতে বসন্তের যখন কোনোকালে অস্তিত্ব ছিল না, তখন সে অস্তিত্বের কোনোকালে লোপ হতে পারে না। আমরা ও-বস্তু যদি হারাই তবে সে আমাদের অমনোযোগের দরুন। যে জিনিস মানুষের মন-গড়া, তা মানুষের মন দিয়েই খাড়া রাখতে হয়। পূর্ব-কবিরা কায়মনোবাক্যে যে রূপের-ঋতু গড়ে তুলেছেন, সেটিকে হেলায় হারানো বুদ্ধির কাজ নয়। সুতরাং বৈজ্ঞানিকেরা যখন বস্তুগত্যা প্রকৃতিকে মানুষের দাসী করেছেন, তখন কবিদের কর্তব্য হচ্ছে কল্পনার সাহায্যে তাঁর দেবীত্ব রক্ষা করা। এবং এ উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে তাঁর মূর্তির পূজা করতে হবে; কেননা, পূজা না পেলে দেবদেবীরা যে অন্তর্ধান হন, এ সত্য তো ভুবনবিখ্যাত। দেবতা যে মন্ত্রাত্মক। আর এ পূজা যে অবশ্য-কর্তব্য তার কারণ, বসন্ত যদি অতঃপর আমাদের অন্তরে লাট খেয়ে যায়, তা হলে সরস্বতীর সেবকেরা নিশ্চয়ই

স্ফীত হয়ে উঠবে, তাতে করে বঙ্গসাহিত্যের জীবনসংশয় ঘটতে পারে। এস্থলে সাহিত্যসমাজকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, একালে আমরা যাকে সরস্বতীপূজা বলি, আদিতে তা ছিল বসন্তোৎসব।

চৈত্র ১৩২৩